মওলানা আজাদ সুবহানি

বিপ্লবী নবী

মওলানা আজাদ সুবহানি

বিপ্লবী নবী

অনুবাদ : মওলানা মুজিবুর রহমান

সম্পাদনা : মওলবি আশরাফ

মওলানা আজাদ সুবহানি : জীবন ও কর্ম

পরিচয়

তার প্রকৃত নাম আবদুল কাদির। উর্দু ভাষায় লেখকদের আলাদা নাম গ্রহণের রেওয়াজ আছে, একে বলে তখল্লুস। 'আজাদ সুবহানি' তার তখল্লুস। তার পিতা শেখ মুহাম্মদ মুরতাজা ছিলেন জনৈক জমিদারের একজন সাধারণ পেয়াদা, তবে ব্যক্তিজীবনে ছিলেন একজন মহান বুজুর্গ। তার মায়ের নাম নাজেরা খাতুন, তিনি ছিলেন ইরানি বংশোদ্ভূত। আজাদ সুবহানির বয়স যখন চার বা ছয়, তখন তার মা ইন্তেকাল করেন।

পয়দায়েশ

মওলানা আজাদ সুবহানির জন্ম ভারতের উত্তর প্রদেশে, বালিয়া জেলার সিকান্দারপুরে। তার জন্মসালের সঠিক তথ্য জানা যায় না, ১৮৭৩ থেকে ১৮৮৪ সালের কোনো এক সময়ে জন্ম। তবে বেশির ভাগ ইতিহাসবিদ ১৮৮২ সালের কথা উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষা

মওলানা আজাদ সুবহানির পিতা তাকে অত্যাধিক ভালোবাসতেন। মা মরা ছেলেকে তিনি কাছছাড়া করতে চাইতেন না। এছাড়াও তার বড় একটা সময় কাটতো এবাদত-বন্দেগিতে, তিনি ভুলেই গেছিলেন

ছেলেকে পড়াশোনা করাতে হবে। তার বয়স যখন চৌদ্দ, একদিন ঘুড়ি উড়ানোর সময় হঠাৎ তার মনে হলো ভেতর থেকে কেউ বলছে–'আবদুল কাদির, কতকাল আর খেলাধুলা করে সময় নষ্ট করবে!' এই ভাবনাই তার মধ্যে বড়সড় পরিবর্তন আনে। তিনি ঘর ছেড়ে তার ফুফুর কাছে চলে যান, এবং তার কাছেই হাতেখড়ি হয়। পড়াশোনার প্রতি তার আগ্রহ দেখে জৌনপুর মাদরাসায় ভর্তি করানো হয়। ওই সময় তার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রসিদ্ধ আলেম মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ রায়পুরি। আজাদ সুবহানি খুব মনোযোগের সাথে পড়াশোনা শুরু করেন। এরপর উচ্চতর পড়াশোনার জন্য তিনি রায়পুর মাদরাসায়ে আলিয়ায় ভর্তি হন, এখানে তিনি মাওলানা তৈয়ব নামক জনৈক আরবের কাছ থেকে আরবি ভাষা শিখেন। তারপর তিনি লখনৌর ফিরিঙ্গি মহলে যান, সেখানে মাওলানা ওসি আহমদ মুহাদ্দিসে সুরতির কাছে তফসির ও হাদিসের তালিম নেন। ১৯০৩ সালে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

এছাড়াও চিকিৎসা শাস্ত্রে তার আগ্রহ ছিল। এই সূত্র ধরে হেকিম সিদ্দিক আহমদ সিদ্দিকির কাছে চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়েও পড়াশোনা করেন।

ওস্তাদের নসিহত

ছাত্র অবস্থায় একবার তার নামে নালিশ করা হয়–কিতাবে যা লেখা আছে, তিনি তার উলটো কথা বলেন। মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ সাহেব আজাদ সুবহানির মেধাশক্তি সম্পর্কে জানতেন, তিনি ছাত্রকে ডেকে বলেন—

> 'বাবা, মুখস্থ করার নাম এলেম না, এলেম হলো চিন্তা-ফিকির করার নাম। অন্য ছাত্রদের সাথে তোমার মতবিরোধ হলে হোক, এ নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নাই।'

ওস্তাদের এই কথা আজাদ সুবহানিকে খুব প্রভাবিত করে। আজাদ সুবহানির ছেলে হাসান সুবহানি বলেন, 'আব্বা মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ সাহেবের আত্মনির্ভরতা ও একদম মাটির মানুষ হয়ে থাকার গুণ দ্বারা খুব প্রভাবিত ছিলেন।' তিনি জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ওস্তাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন।

বিবাহ ও সন্তানাদি

মওলানা আজাদ সুবহানি মাত্র পনের বছর বয়সে বিবাহ করেছিলেন। তার দুই সন্তানের নাম পাওয়া যায়—জামিলা খাতুন ও হাসান সুবহানি। এছাড়াও তার আরও দুজন সন্তানের কথা কেউ কেউ বলেছেন, কিন্তু তাদের সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

শিক্ষকতা জীবন

১৯০৮ সালের ডিসেম্বরে তিনি কানপুরে যান, সেখানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাদান শুরু করেন। মাদরাসার নাম ছিল 'মাদরাসায়ে ইলাহিইয়াত'। যেহেতু তার আগ্রহের প্রধান জায়গা ছিল দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব, তাই মাদরাসাতে পুরোদমে এর চর্চা শুরু হয়। এই মাদরাসা ১৯১৯ সাল পর্যন্ত তার চিন্তাদর্শনের ওপর পরিচালিত হয়, এরপর মাদরাসার কয়েকজন পৃষ্ঠপোষক ব্যবসায়ী অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। আস্তে আস্তে মাদরাসা তার প্রাণ হারিয়ে ফেলে।

রাজনৈতিক জীবনের প্রথম আন্দোলন

কানপুর থাকাকালীন প্রায় মাদরাসা প্রাঙ্গণে সাহিত্য, ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক আড্ডা হতো। সময়টা ছিল এমন—একদিকে খ্রিষ্টান পাদ্রিরা জোরেশোরে মিশনারির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে আর্য সমাজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাধারণ হিন্দুদের উস্কে দিচ্ছে। এমন

পরিস্থিতিতে উগ্র হিন্দুদের একটি দল কানপুরের মাছলি বাজার মসজিদটি ভেঙে ফেলে। আসলে এর পেছনে কলকাঠি নাড়ছিল খোদ ইংরেজ সরকার, কারণ তাদের ওখানে রাস্তা করার প্রয়োজন ছিল। এর প্রতিবাদে ৩ অগাস্ট ১৯১৩ সালে আজাদ সুবহানি একটি সম্মেলনের ডাক দেন, তাতে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের সমাগম হয়। ইংরেজ সরকার একে সাম্রাজ্যবাদের জন্য হুমকি মনে করে এবং সম্মেলনে সরাসরি গুলি ছুঁড়ে। বেশ কয়েকজন নওজোয়ান শহিদ হন। আজাদ সুবহানি তার শতাধিক অনুসারীরসহ গ্রেফতার হন। তিন মাস জেল খাটার পর অবশেষে ১৬ অক্টোবর তিনি মুক্তি পান।

রেশমি রুমাল আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতের স্বাধীনতাকামী মুসলিমরা তুরস্ক, জার্মান ও রাশিয়ার সাহায্যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছিলেন। শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দির নির্দেশে এবং মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধির নেতৃত্বে শুরু হওয়া এই আন্দোলন ইতিহাসে 'রেশমি রুমাল আন্দোলন' নামে পরিচিত। মওলানা সিন্ধি এর জন্য 'প্রবাসী ভারত সরকার' গঠন করেছিলেন, এবং 'জুনুদে রব্বানিয়া' (বাংলা অর্থ–রব্বানি দল) নামে একটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। পরে এই পরিকল্পনা ইংরেজদের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। এই রেশমি আন্দোলনে যারা অংশ নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে আজাদ সুবহানিও ছিলেন। ইংরেজদের রিপোর্টে লেখা হয়েছে—

> 'কানপুর মাদরাসায়ে ইলাহিইয়াতের আবদুল কাদির আজাদ সুবহানি, খুবই দুষ্টপ্রকৃতির লোক। তার অনুসারীর সংখ্যাও কম নয়। কানপুর মসজিদ নিয়ে যে আন্দোলন হয়েছে, তার মূলহোতা ছিল সে। এই লোক জুনুদে রব্বানিয়ার মেজর জেনারেলের তালিকাতেও আছে।'

কাব্যচর্চা

কবিতার প্রতি মওলানা আজাদ সুবহানির খুব আগ্রহ ছিল। তিনি অনেক কবিতাও লিখেছেন। ১৯২০ সালে তিনি 'হালকায়ে আদাবিইয়া' নামে একটি সাহিত্যসংঘ তৈরি করেন। অনেকেই এই সংঘ থেকে 'বড় কবি' হয়ে উঠেছেন।

মাসিক রুহানিয়াত

১৯২৫ সালে গোরখপুর থেকে আজাদ সুবহানির সম্পাদনায় 'রুহানিয়াত' নামে একটি মাসিক ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। এই ম্যাগাজিনের মধ্য তিনি মুসলমানদের অনেক সমস্যা ও তার সমাধান হাজির করার চেষ্টা করেছেন। প্রসিদ্ধ আলেম সাইয়িদ সুলাইমান নদবি তার এই ম্যাগাজিনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। দেড় থেকে দুই বছর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর ম্যাগাজিনটি বন্ধ হয়ে যায়।

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও খেলাফত আন্দোলন

আজাদ সুবহানি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতের পক্ষপাতী ছিলেন। এই ভাবনা থেকেই তিনি অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসকে সমর্থন করেন। ১৯২৩ সালে তিনি উত্তর প্রদেশে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯৩০ সালে 'লবণ সত্যাগ্রহে' যখন অনেক মুসলমান গ্রেফতার হয়, কিন্তু গান্ধীজি হিন্দুদের পক্ষপাত নেয়, তখন আজাদ সুবহানি কংগ্রেসের সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এর মধ্যে তিনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন, সেখানে নিজের বক্তব্য পেশ করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি মুসলিম লিগের সাথে পুরাপুরি সম্পৃক্ত হন, এবং স্পষ্ট পাকিস্তান আন্দোলনের প্রচার শুরু করেন।

এই সময়কালে তুরস্কে ওসমানি খেলাফতের পতন হলে উপমহাদেশে যে খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়, আজাদ সুবহানি এতেও অংশ নেন।

অসহযোগ আন্দোলন ও খদ্দরের কাপড়

অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে উপমহাদেশে সবাই ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করতে শুরু করে। আজাদ সুবহানির বন্ধু ও সহযোদ্ধা মওলানা হাসরত মোহানি 'স্বদেশি স্টোর' নামে একটি দোকান খুলেন। এই সময় আজাদ সুবহানিও খদ্দরের কাপড় পরতে শুরু করেন, এবং সবাইকে এই কাপড় পরতে বলতেন।

বক্তৃতা কৌশল ও জনতার সাথে সম্পৃক্ততা

মওলানা আজাদ সুবহানি সাধারণ মানুষের সাথে তাদের ভাষায় কথা বলতেন। মানুষ বলাবলি করত–'কী সুন্দর কথা বলেন, কথা না বরং জাদু করেন। অনেক বড় দার্শনিক।' তিনি তার বক্তৃতায় দর্শনের বিষয়গুলো দলিল-প্রমাণের সাথে এমনভাবে উপস্থাপন করতেন, সবাই বুঝতে পারত। তার বক্তৃতা শোনার পর কোনো কোনো লোক এ কথাও বলত–'সারাজীবন দেখেছি যারা ভালো বক্তা হয়, তাদের ঝুলিতে কিছু থাকে না। আবার যাদের ঝুলিতে অনেক কিছু থাকে, তারা ভালো বক্তা হয় না। কিন্তু এই লোক একদম আলাদা। কথা শুনলেই বোঝা যায় তার ঝুলি খালি না।'

দুনিয়ার মুসাফির

মওলানা আজাদ সুবহানি কোথাও বেশিদিন স্থির থাকতেন না, তার জীবনের লম্বা সময়ই কেটেছে সফরে সফরে। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক দেশেই তিনি সফর করেন। ইউরোপ ও আমেরিকা সফরের ওপর তিনি কিতাবও লিখেন। এই সব সফর

থেকে প্রাপ্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান তার অ্যাক্টিভিটিতে প্রভাব ফেলেছিল। মৃত্যুর আগে সর্বশেষ বিদেশ সফরে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় গেছিলেন।

আবার জেল

১৯৩৬ সালে আরব সফরের কয়েক মাস আগে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়েজে কর্মরত ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে তিনি একটা ভাষণ দেন। এই ভাষণের পর তাকে গ্রেফতার করে লখনৌর জেলে পাঠানো হয়।

জিয়ারতে কাবা ও সর্বোত্তম জেহাদ

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে মওলানা আজাদ সুবহানি প্রথমবারের মতো হেজাজ সফর করেন। এবং হজ করার সৌভাগ্য অর্জন হয়। তার বন্ধু মাওলানা দাউদ গজনবি আগে থেকেই সেখানে ছিলেন, তার মধ্যস্থতায় তিনি রাজকীয় মেহমান হন। বাদশাহ আবদুল আজিজ বিন সৌদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তো, আমাদের দেশ কেমন দেখলেন।' সাধারণত বাদশাহর এতটা কাছাকাছি কেউ পৌঁছতে পারলে খোশামুদি করার সুযোগ ছাড়ে না, এবং এতে ভালো উপহার-উপঢৌকনও লাভ হয়। কিন্তু মওলানা সুবহানির মেজাজ ছিল বিপ্লবাত্মক। তিনি বাদশাহর সাথে বেয়াদবি না করেই বললেন—

> 'বাদশাহ নামদার, আমি খুবই গরিব একটা দেশ থেকে এসেছি, কিন্তু মক্কা-মদিনার আশেপাশে মানুষের যে গরিবি হালত দেখেছি—আমার রুহ কেঁপে উঠেছে, মন এই দৃশ্য মেনে নিতে পারছে না।'

এরপর আরও কিছু কথাবার্তার পরে বলেন—

> 'ইংরেজদের সাথে সখ্যতার কারণে এই দেশে পাশ্চাত্য প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে, একই সাথে দীনদারি ও ধর্মের প্রতি আগ্রহ কমে

যাচ্ছে। এই জন্য সৌদি সরকারের প্রয়োজন গরিবি দূর করা এবং পশ্চিমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।'

বাদশাহ আবদুল আজিজ তার এই নসিহত খুবই অপছন্দ করলেন। কিন্তু রাজকীয় মেহমান হওয়ায় কিছু বললেন না। ফেরার পথে মাওলানা দাউদ গজনবি বললেন, 'আপনি এভাবে বলতে গেলেন কেন?' আজাদ সুবহানি বললেন, 'এভাবে বলাটাও জেহাদ।'

বলা আবশ্যক, সৌদ পরিবার ইংরেজদের প্রত্যক্ষ মদদে হেজাজ অঞ্চল দখল করে, এবং তাকে 'সৌদি আরব' বানায়। অনেকেই মনে করেন মক্কা-মদিনা সৌদ পরিবারের হাতে থাকা আর ইহুদি-খ্রিষ্টানদের হাতে থাকার মধ্যে কোনো তফাৎ নাই। সৌদ সরকার বরাবরই হেজাজ বা মক্কা-মদিনার অধিবাসীদের ওপর জুলুম করে আসছে। আর হাদিসের ভাষ্যমতে সর্বোত্তম জেহাদ হলো কোনো জালেম শাসকের সামনে হক কথা বলা। আজাদ সুবহানি ঠিক সেই কাজটিই করেছিলেন।

মিশর সফর

১৯৩৬ সালে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে তিনি মিশর সফর করেন। এই সফর হজের সফরের সাথে হয়েছিল কিনা জানা যায় না, তবে মওলানা ভাসানী তার সফরসঙ্গী ছিলেন বলে বর্ণনা আছে।

আজাদ বনাম আজাদ

মওলানা আজাদ সুবহানি প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ ও ইসলাম বিশেষজ্ঞ মওলানা আবুল কালাম আজাদ থেকে একেবারে কম ছিলেন না। মওলানা আজাদ কলকাতার একটি ঈদগাহে দুই ঈদের নামাজ

পড়াতেন। কংগ্রেস ও গান্ধীজির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে কলকাতার মুসলমানরা তাকে বরখাস্ত করে। তার জায়গায় কে নামাজ পড়াবে, এর তালাশ করতে গিয়ে মওলানা আজাদ সুবহানিকে খুঁজে পায়। মওলানা দুই বৎসর সেই ঈদগাহে নামাজ পড়ান। এই ঘটনা ১৯৩৮ সালের।

জমিয়তে রব্বানিয়া

১৯৪৫ সালে মওলানা আজাদ সুবহানি 'জমিয়তে রব্বানিয়া' আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু এই আন্দোলন সফলের জন্য তিনি 'ইসলামভিত্তিক আলাদা রাষ্ট্র'-কে অত্যাবশ্যক বলেন। তিনি মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্র বানানোর আবশ্যকীয়তা নিয়ে লিখতে শুরু করেন, এই বিষয়ে তার বই 'দাওয়াত'-এ একটি অধ্যায় আছে।

কমিউনিস্ট মওলানা

মওলানা আজাদ সুবহানি গভীর মনোযোগের সাথে মার্কসবাদের বইগুলো পড়েন। কার্ল মার্কসের পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, অর্থনৈতিক সাম্যের ধারণা এবং বিপ্লবাত্মক মনোভাব তাকে খুব প্রভাবিত করে। তার আলাপ-আলোচনায় এর প্রকাশ পাওয়া যেত। এই জন্য মানুষ তাকে 'কমিউনিস্ট মওলানা' বলত। তিনি 'না' করতেন না, কিন্তু বলতেন–'but with Allah.' তিনি বলতেন, 'কার্ল মার্কসের কমিউনিজম আল্লাহ নেই, অন্যদিকে আমার কমিউনিজমের ভিত্তিই হলো আল্লাহকে স্বীকার করার ওপর।'

মওলানা প্রায় এ কথা বলতেন, 'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বিপ্লবী হলেন আল্লাহর রসুল (স.)। তিনি মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে একটা জাতিকে জাহিলিয়াত থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য মানুষে পরিবর্তিত করেছেন, এবং সেই বিপ্লবের ফল আজও রয়ে গেছে।'

মওলানার উদার মনোভাবের কারণে অনেক কমিউনিস্ট নেতা তার সাথে ওঠাবসা করতেন। কিন্তু মওলানা নিজে কখনও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হননি।

মওলানা ভাসানীর সাথে সম্পর্ক

মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন আসে মওলানা আজাদ সুবহানির সাথে পরিচয়ের পর। এমনিতে তিনি ছিলেন আজীবন সংগ্রামী, ক্ষমতাসীন হওয়ার চেয়ে মজলুমের কণ্ঠ হয়ে থাকাই তার অধিক পছন্দ ছিল। কিন্তু বামধারার রাজনীতির সাথে তার কোনো যোগসজেশ ছিল না। আজাদ সুবহানির প্রভাবে তিনি বামপন্থী রাজনীতি শুরু করেন, কিন্তু তার ভাষ্যে এটা ছিল 'রব্বানি' রাজনীতির প্রথম ধাপ। মওলানা ভাসানী ১৯৭৪ সালে লেখা তার *'হুকুমতে রব্বানিয়া : কী ও কেন'* প্রবন্ধে পুরো ঘটনা এভাবে ব্যক্ত করেন (হুবহু উল্লেখ)—

> সে ১৯৪৬ সালের কথা। রাত তখন বারটা। বিপ্লবী দার্শনিক আল্লামা আজাদ সোবহানী ধুবরীর (আসাম) একটি ঘরে বসিয়া একটার পর একটা সিগারেট টানিতেছেন। আমি নিশ্চুপ হইয়া তাঁহার সামনে বসিয়া রহিয়াছি। হঠাৎ তিনি আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিলেন ও আমার ডান হাতখানা সিগারেটের ছাই ফেলার পাত্রটির উপর রাখিয়া বলিলেন, মনে কর ইহাই কাবা ঘর। আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। কিন্তু এই দার্শনিকের উন্মাদনা আমার জানা ছিল। তাই বলিলাম, হাঁ ইহাই কাবা ঘর। আল্লামা বলিলেন, তবে আজ ওয়াদা কর, তুমি রাজনৈতিক জীবনে যত কলাকৌশলই নাও না কেন মূলতঃ হুকুমতে রব্বানিয়া কায়েমের লক্ষ্যে সংগ্রাম করিয়া যাইবা। তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়িল ১৯৩৫ সালে আমরূহাতে ১৭ জন আলেম রাজনীতিবিদের সিদ্ধান্তের কথা। মনে পড়িল মওলানা

> মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা হাসরত মোহানী, মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী প্রমুখের সাথে আমার যোগাযোগ ও ওয়াদার কথা। আমার মনে পড়িল খিলাফত আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তু ও মওলানা মোহাম্মদ আলীর সাহচর্যের কথা। আমি দেখিলাম যৌবনের উচ্ছ্বাস-শেষে যে রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম আজ প্রৌঢ় জীবনে সেই রাজনৈতিক দর্শনের দাওয়াতই আসিয়াছে। আমি তাই ইতস্তত করিলাম না। মওলানা আজাদ সোবহানীর হাতের উপর আমার হাত ছিল। তাঁহার কল্পনায় আমাদের হাত কাবাতে নিবদ্ধ ছিল। আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ, ওয়াদা করিলাম, রাজনীতিতে যাহা কিছুই করি না কেন হুকুমতে রব্বানিয়া হইতে লক্ষ্যচ্যুত হইব না।'
>
> দীর্ঘ ২৭টি বছর কাটিয়া গিয়াছে। আজ আমি ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে চাই না কীভাবে আমি ধাপে ধাপে হুকুমতে রব্বানিয়া কায়েমের পথে চলিয়া আসিয়াছি। অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন কোনো ভাষ্যকার যদি আবিষ্কার করিতে পারেন, তবে দেখিবেন ১৯২১ সাল হইতে আমি এই পথ ধরিয়াছি।...

যাই হোক, একটা বিষয় স্পষ্ট—মওলানা ভাসানীর বামপন্থা প্রচলিত বামপন্থার আদলে ছিল না। বরং তার সম্পর্ক ছিল মওলানা আজাদ সুবহানি ও মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি হয়ে শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবির সাথে। ভাসানীর আদর্শ বুঝতে হলে তাদেরকেও বুঝতে হবে।

নবীপ্রেম

মওলানা আজাদ সুবহানির আল্লাহর নবীর (স.) প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল। তিনি মুরিদদের মাঝে রসুলের (স.) মর্যাদা ও শানে এমন এমন কথা বলতেন, মুরিদদের মধ্যে অন্যরকম অবস্থা তৈরি হতো। তার অন্যতম মুরিদ মিয়াঁ জফির আহমদ বলেন—

তিনি একদিন বললেন, 'মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা করার মতো এখনও শব্দ তৈরি হয়নি। তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে, আল্লাহ তাআলার নুরের বহিঃপ্রকাশ।'

দর্শনচর্চা

মওলানা আজাদ সুবহানির মধ্যে দর্শন ও মান্তেকের অনেক প্রভাব ছিল। তিনি ইসলাম ও কোরআনের নানাবিধ বিষয় দর্শনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতেন। ওই সময় তার মতো করে ব্যাখ্যা করা কিংবা তার ব্যাখ্যার সমালোচনা করার মতো কোনো আলেম ছিল না। তার দর্শনচিন্তার মূলনীতি ছিল তিনটা :

- আল্লাহ সবচেয়ে বড়।
- মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর নায়েব বা প্রতিনিধি।
- আমরা আল্লাহর খলিফা এবং মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতিনিধি।

খুব সম্ভবত ভিন্নধর্মী দার্শনিক চিন্তার কারণেই তিনি অন্যান্য আলেম থেকে দূরে থাকতেন। তিনি হাল আমলে মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ হিসেবে দর্শনের চর্চা না করাকে দায়ী করতেন।

রচনাবলি

মওলানা আজাদ সুবহানির অনেক বই ও প্রবন্ধ লিখেছেন, যার অধিকাংশই সংরক্ষিত হয়নি। এর মধ্যে যেসব বইয়ের নাম পাওয়া যায়—

- আল কুল্লিয়াত (দর্শন)
- মুকাদ্দামায়ে তফসিরে রব্বানি
- যবুরে রব্বানি (কবিতা)